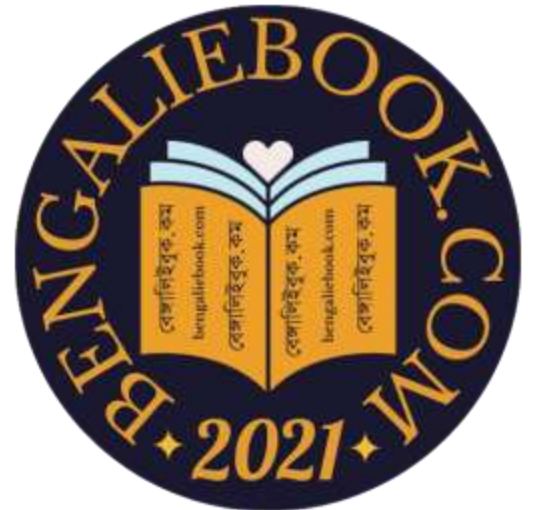


গল্প

হরিচরন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



হরিচরণ

“—” সে আজ অনেকদিনের কথা। প্রায় দশ-বারো বৎসরের কথা। তখন দুর্গাদাসবাবু উকিল হন নাই। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি বোধ হয় ভাল চেনো না, আমি বেশ চিনি। এসো তাঁহাকে আজ পরিচিত করিয়া দিই।

ছেলেবেলায় কোথা হইতে এক অনাথ পিতৃমাতৃহীন কায়স্থ বালক রামদাসবাবুর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সকলেই বলিত, ছেলেটি বড় ভাল! বেশ সুন্দর বুদ্ধিমান চাকর, দুর্গাদাসবাবুর পিতার বড় স্নেহের ভৃত্য।

সব কাজকর্মই সে নিজে টানিয়া লয়। গরুর জাব দেওয়া হইতে বাবুকে তেল মাখান পর্যন্ত সমস্তই সে নিজে করিতে চাহে। সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে বড় ভালবাসে।

ছেলেটির নাম হরিচরণ। গৃহিণী প্রায়ই হরিচরণের কাজকর্মে বিস্মিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও করিতেন, বলিতেন, হরি-অন্য চাকর আছে; তুই ছেলেমানুষ, এত খাটিস কেন? হরির দোষের মধ্যে ছিল সে বড় হাসিতে ভালবাসিত। হাসিয়া উত্তর করিত, মা, আমরা গরীব লোক, চিরকাল খাটতেই হবে, আর বসে থেকেই বা কি হবে?

এইরূপ কাজকর্মে, সুখে, স্নেহের ক্রোড়ে হরিচরণের প্রায় এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল।

সুরো রামদাসবাবুর ছোট মেয়ে। সুরোর বয়স এখন প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর। হরিচরণের সহিত সুরোর বড় আত্মীয়ভাব দেখা যাইত! যখন দুগ্ধ-পানের নিমিত্ত গৃহিণীর সহিত সুরো দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিত, যখন মা অনেক অযথা বচসা করিয়া ও এই ক্ষুদ্র কন্যাটিকে

স্বমতে আনিতে পারিতেন না এবং দুধ-পানের বিশেষ আবশ্যিকতা ও তাহার অভাবে কন্যারত্নের আশু প্রাণবিয়োগের আশঙ্কায় শঙ্কান্বিত হইয়া বিষম ক্রোধে সুরবালার গণ্ডদ্বয়বিশেষ টিপিয়া ধরিয়াও তাহাকে দুধ খাওয়াইতে পারিতেন না, তখনও হরিচরণের কথায় অনেক ফল লাভ হইত।

যাক, অনেক বাজে কথা বকিয়া ফেলিলাম। আসল কথাটা এখন বলি, শোনো। না হয় সুরো হরিচরণকে ভালবাসিত।

দুর্গাদাসবাবুর যখন কুড়ি বৎসর বয়স, তখনকার কথাই বলিতেছি। দুর্গাদাস এতদিন কলিকাতাতেই পড়িত। বাড়ি আসিতে হইলে স্তিমারে দক্ষিণ দিকে যাইতে হইত, তাহার পরেও প্রায় হাঁটা-পথে দশ-বারো ক্রোশ আসিতে হইত; সুতরাং পথটা বড় সহজগম্য ছিল না। এইজন্যই দুর্গাদাসবাবু বড় একটা বাড়ি যাইতেন না।

ছেলে বি. এ. পাস হইয়া বাড়ি আসিয়াছে। মাতাঠাকুরানী অতিশয় ব্যস্ত। ছেলেকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে, দাওয়াইতে, যত্ন-আত্মীয়তা করিতে, যেন বাটীসুদ্ধ সকলেই একসঙ্গে উৎকর্ষিত হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্গাদাস জিজ্ঞাসা করিল, মা, এ ছেলেটি কে গা? মা বলিলেন, এটি একজন কয়েতের ছেলে; বাপ-মা নেই, তাই কর্তা ওকে নিজে রেখেছেন। চাকরের কাজকর্ম সমস্তই করে, আর বড় শান্ত; কোন কথাতেই রাগ করে না। আহা! বাপ-মা নেই—তাতে ছেলেমানুষ—আমি বড় ভালবাসি।

বাড়ি আসিয়া দুর্গাদাসবাবু হরিচরণের এই পরিচয় পাইলেন।

যাহা হোক, আজকাল হরিচরণের অনেক কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। সে তাহাতে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট নহে। ছোটবাবুকে (দুর্গাদাসকে) স্নান করান, দরকার-মত জলের গাডু, ঠিক সময়ে পানের ডিবে, উপযুক্ত অবসরে হুঁকা ইত্যাদি যোগাড় করিয়া রাখিতে হরিচরণ

বেশ পটু। দুর্গাদাসবাবুও প্রায় ভাবেন, ছেলেটি বেশ intelligent. সুতরাং, কাপড় কোঁচান, তামাক সাজা প্রভৃতি কর্ম হরিচরণ না করিলে দুর্গাদাসবাবুর পছন্দ হয় না।

কিছু বুঝি না, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। মনে আছে কি? একবার দুজনে কাঁদিতে কাঁদিতে পড়ি বড়ই দুর্লভ তত্ত্ব। আমার বোধ হয় সব কথাতেই এটা খাটে। দেখেছ কি—ভাল থেকে কেবল ভালই দাঁড়ায়, মন্দ কি কখনও আসিয়া দাঁড়ায় না? যদি না দেখিয়া থাক তবে এসো, আজ তোমাকে দেখাই—বড়ই দুর্লভ তত্ত্ব।

উপরি-উক্ত কথা-কয়টি সকলের বুঝিতে পারা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নাই, আর আমারও philosophy নিয়ে deal করা উদ্দেশ্য নহে; তবুও আপসে দুটো কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি কি?

আজ দুর্গাদাসবাবুর একটা জাঁকাল ভোজের নিমন্ত্রণ আছে। বাড়িতে খাইবেন না, সম্ভবতঃ অনেক রাতে ফিরিবেন। এইসব কারণে হরিচরণকে প্রাত্যহিক কর্ম সারিয়া রাখিয়া শয়ন করিতে বলিয়া গেছেন।

এখন হরিচরণের কথা বলি। দুর্গাদাসবাবু বাহিরে বসিবার ঘরেই রাতে শয়ন করিতেন। তাহার কারণ অনেকেই অবগত নহে। আমার বোধ হয় গৃহিণী বাপের বাড়িতে থাকায়, বাহিরের ঘরে শয়ন করাই তাঁহার অধিক মনোনীত ছিল।

রাতে দুর্গাদাসবাবুর শয্যা রচনা করা, তিনি শয়ন করিলে তাঁহার পদসেবা ইত্যাদি কাজ হরিচরণের ছিল। পরে বাবুর রীতিমত নিদ্রাকর্ষণ হইলে হরিচরণ পাশের একটি ঘরে শুইতে যাইত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই হরিচরণের মাথা টিপটিপ করিতে লাগিল। হরিচরণ বুঝিল, জ্বর আসিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। মধ্যে মধ্যে তাহার প্রায়ই জ্বর হইত; সুতরাং এ-সব লক্ষণ তাহার বিশেষ জানা ছিল। হরিচরণ আর বসিতে পারিল না, ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। ছোটবাবুর যে বিছানা প্রস্তুত হইল না, এ কথা আর মনে রহিল না। রাতে সকলেই

আহারাди করিল, কিন্তু হরিচরণ আসিল না। গৃহিণী দেখিতে আসিলেন। হরিচরণ ঘুমাইয়া আছে; গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন গা বড় গরম। বুঝিলেন, জ্বর হইয়াছে; সুতরাং আর বিরক্ত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। ভোজ শেষ করিয়া দুর্গাদাসবাবু বাড়ি আসিয়া দেখিলেন, শয্যা প্রস্তুত হয় নাই। একে ঘুমের ঘোর, তাহাতে আবার সমস্ত পথ কি করিয়া বাড়ি যাইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িবেন, আর হরিচরণ শ্রান্ত পদযুগলকে বিনামা হইতে বিমুক্ত করিয়া অল্প অল্প টিপিয়া দিতে থাকিবে এবং সেই সুখে অল্প তন্দ্রার ঝোঁকে গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া একেবারে প্রভাত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন।

একবারে হতাশ হইয়া বিষম জ্বলিয়া উঠিলেন, মহা ক্রুদ্ধ হইয়া দুই-চারিবার হরিচরণ, হরি, হরে-ইত্যাদি রবে চিৎকার করিলেন। কিন্তু কোথায় হরি? সে জ্বরের প্রকোপে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে। তখন দুর্গাদাসবাবু ভাবিলেন, বেটা ঘুমাইয়াছে; ঘরে গিয়া দেখিলেন, বেশ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

আর সহ্য হইল না। ভয়ানক জোরে হরির চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হরি চলিয়া বিছানার উপর পুনর্বার শুইয়া পড়িল। তখন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গাদাসবাবু হিতাহিত বিস্মৃত হইলেন। হরির পিঠে সবুট পদাঘাত করিলেন। সে ভীম প্রহারে চৈতন্যলাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কচি খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে, বিছানাটা কি আমি করব? কথায় কথায় রাগ আরও বাড়িয়া গেল; হস্তের বেত্র-যষ্টি আবার হরিচরণের পৃষ্ঠে বার দুই-তিন পড়িয়া গেল।

হরি রাত্রে যখন পদসেবা করিতেছিল, তখন এক ফোঁটা গরম জল বোধ হয় দুর্গাদাসবাবুর পায়ের উপর পড়িয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি দুর্গাদাসবাবুর নিদ্রা হয় নাই। এক ফোঁটা জল বড়ই গরম বোধ হইয়াছিল। দুর্গাদাসবাবু হরিচরণকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাহার নম্রতার জন্য সে

দুর্গাদাসবাবুর কেন, সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল। বিশেষ এই মাস-খানেকের ঘনিষ্ঠতায় সে আরও প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাত্রে কতবার দুর্গাদাসবাবুর মনে হইল যে, একবার দেখিয়া আসেন, কত লাগিয়াছে, কত ফুলিয়াছে। কিন্তু সে যে চাকর, তা ত ভাল দেখায় না! কতবার মনে হইল, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসেন, জ্বরটা কমিয়াছে কি না! কিন্তু তাহাতে যে লজ্জা বোধ হয়! সকালবেলায় হরিচরণ মুখ ধুইবার জল আনিয়া দিল, তামাক সাজিয়া দিল। দুর্গাদাসবাবু তখনও যদি বলিতেন, আহা! সে ত বালক মাত্র, তখনও ত তাহার ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। বালক বলিয়াও যদি একবার কাছে টানিয়া লইয়া দেখিতেন, তোমার বেতের আঘাতে কিরূপ রক্ত জমিয়া আছে, তোমার জুতার কাঠিতে কিরূপ ফুলিয়া উঠিয়াছে। বালককে আর লজ্জা কি?

বেলা নয়টার সময় কোথা হইতে একখানা টেলিগ্রাম আসিল। তারের সংবাদে দুর্গাদাসবাবুর মনটা কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। খুলিয়া দেখিলেন, স্ত্রীর বড় পীড়া। ধড়াস করিয়া বুকখানা এক হাত বসিয়া গেল। সেইদিনই তাঁহাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল। গাড়িতে উঠিয়া ভাবিলেন, ভগবান! বুঝি-বা প্রায়শ্চিত্ত হয়।

প্রায় মাস-খানেক হইয়া গিয়াছে। দুর্গাদাসবাবুর মুখখানি আজ বড় প্রফুল্ল, তাঁহার স্ত্রী এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন। অদ্য পথ্য পাইয়াছেন।

বাড়ি হইতে আজ একখানা পত্র আসিয়াছে। পত্রখানি দুর্গাদাসবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার লিখিত। তলায় একস্থানে ‘পুনশ্চ’ বলিয়া লিখিত রহিয়াছে—বড় দুঃখের কথা, কাল সকালবেলা দশ দিনের জ্বরবিকারে আমাদের হরিচরণ মরিয়া গিয়াছে। মরিবার আগে সে অনেকবার আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছিল।

আহা! মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ!

ধীরে ধীরে দুর্গাদাসবাবু পত্রখানা শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন।